বাংলা নববর্ষ ও আমাদের সংস্কৃতি (পর্ব-২)

মুহম্মদ মতিউর রহমান

প্রথম পর্বঃ বাংলা নববর্ষ ও আমাদের সংস্কৃতি

বাংলাদেশ সর্বদাই ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ। বিশেষত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি ইসলামের অনুসারী। ইসলাম মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি প্রচার করে। ফলে মুসলমানগণ সহনশীলতা, মানবিক সম্প্রীতি ও উদার ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাসী। অন্য ধর্মের উপর জোর-জবরদস্তিতে তারা বিশ্বাসী নয়। বাংলাদেশে মুসলিম শাসনামলের সাড়ে পাঁচশ বছরের ইতিহাসে একটিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় নি। মুসলিম শাসকগণ সর্বদা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান ও উদার ব্যবহার করতেন, কেউ ন্যায়বিচার ও রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হতো না। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনে তারা ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও নির্বিবাদে তারা স্ব স্ব ধর্ম পালন করত। সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায়ও সকলে মুসলিম শাসকদের নিকট থেকে সমান পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতো।

পরবর্তীতে ইংরেজ আমলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বহুলাংশে বিনষ্ট হয়। তখন মুসলমানগণ নানাভাবে বঞ্চিত, শোষিত ও নির্যাতিত হতে থাকে। অন্যদিকে, হিন্দুরা রাজানুগ্রহ পেয়ে অপরিমিত বিত্ত-বৈভব, জমিদারি-জোতদারি, চাকরি-বাকরি ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেয়ে রাতারাতি অকল্পনীয় উন্নতি লাভ করে। ইংরেজদের ভেদ-নীতির কারণে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। রাজানুগ্রহপ্রাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দ্বারা সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানগণ নানাভাবে নিগৃহীত হতে থাকে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির মূল কারণ এটাই। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাক্কালে উপমহাদেশের মুসলমানদের ন্যায্য দাবি অনুযায়ী যখন ভারত বিভক্ত হয়ে “পাকিস্তান” নামে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে ওঠে, তখন এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরো ভয়াবহ রূপ লাভ করে। ইংরেজ আমলে রাজানুগ্রহ ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে হিন্দুরা মুসলিম সমাজের উপর দীর্ঘকাল ধরে যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক আধিপত্য বিস্তার ও শোষণ-নিপীড়ন চালিয়েছে, মুসলমানদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দুদের সে আধিপত্য বজায় থাকবে না বলে তারা এ ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিংসা ও নানারূপ বিদ্বেষমূলক আচরণ শুরু করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য স্বাধীন, স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকে সহজে মেনে নিতে পারে নি। ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। বিভাগোত্তরকালে স্বাধীন ভারতে এ দাঙ্গা তথা সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম নিধন-নির্যাতন অব্যাহত থাকলেও, স্বাধীন পাকিস্তানে তথা বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বদাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজমান রয়েছে।

> বাঙালি হিন্দু-মুসলিম আবহমান কাল থেকে বৈশাখ মাসে নিজ নিজ ধর্মীয় বিধান ও প্রথানুযায়ী বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানের সাড়ম্বর আয়োজন করলেও বাংলা নববর্ষ বা ১লা বৈশাখে তারা তেমন কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতো বলে জানা যায় না। বাংলা নববর্ষ বা ১লা বৈশাখ উদযাপনের রীতিটি সাম্প্রতিক কালের। প্রধানত ইংরাজি নববর্ষ উদ্যাপনের রীতি-রেওয়াজের অনুসরণেই বাংলা নববর্ষ উদযাপন শুরু হয়। ফলে প্রথমোক্তের প্রভাব আমাদের নববর্ষ উদযাপনে বহুলাংশে প্রতিফলিত। অবশ্য ইদানীং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির চেয়ে হিন্দু সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব নববর্ষ উদযাপনে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাঙালি হিন্দুরা আবহমানকাল থেকে চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষে যেসব উৎসব-অনুষ্ঠান বা মেলার আয়োজন করতো এখন বাঙালি মুসলমানগণ, বিশেষত শহরের একশ্রেণির মানুষ, বাংলা নববর্ষ অনেকটা সেভাবেই আনন্দ-ফূর্তির সাথে করা শুরু করেছে। একশ্রেণির মুসলিম নামধারী বুদ্ধিজীবী ও

সংস্কৃতি-কর্মীরাই এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এটাকে মিশ্র সংস্কৃতি বা হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবজাত বলা যায়। কোন বিশেষ সংস্কৃতির স্বভাব-প্রকৃতি যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন অন্য সংস্কৃতি তার উপর ভর করে। যেমন সেন আমলে বাংলাদেশে বৌদ্ধ আধিপত্য খর্ব হবার ফলে ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতিও হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির মধ্যে বিলীন হয়ে এক লোকজ ধর্ম-সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে।

১৯৪৭ সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এবং ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় পর্যায়ে আমরা যেসব উৎসব-অনুষ্ঠান করে থাকি একমাত্র সেগুলোকেই আমাদের সর্বজনীন উৎসব-আনন্দরূপে গণ্য করা চলে। এছাড়া, শতকরা ৯০ জন মুসলিম অধ্যূষিত বাংলাদেশে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানকেও যৌক্তিকভাবেই বাংলাদেশের জাতীয় অনুষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা যায়। ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ বা বিধান পালনার্থে যে বিশিষ্ট জীবনধারা গড়ে উঠেছে সেটাই বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতি। আল-কুরআন ও আল হাদীসের নির্দেশানুযায়ী তা পালিত হয়ে আসছে। তবে যুগে যুগে তার মধ্যে কিছুটা বিকৃতি ঘটেছে, ইদানীং সে বিকৃতির মাত্রা হয়তো আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা ঘটেছে মুসলমানদের অজ্ঞতা ও ক্ষেত্রবিশেষে বিদেশী-বিজাতীয় প্রভাবের ফলে।

পাকিস্তান আমলে বিংশ শতকের ষাটের দশকে একটি বিশেষ ধর্ম-নিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক জোটের উদ্যোগে সর্বপ্রথম ১লা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়। বিশেষ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির উদ্যোগে রমনার বটমূলে গান-বাজনা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলা নববর্ষ করা হয়। ১৯৬৬ সন থেকে আয়োজিত সে অনুষ্ঠান দিনে দিনে ব্যাপকতর হয়। বাংলাদেশ হওয়ার পর তা আরো নানাভাবে জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ১লা বৈশাখ সরকারী ছুটির দিন ঘোষিত হবার ফলে স্বভাবতই এ দিনটির গুরুত্ব এখন আমাদের নিকট পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিক। অতএব, এ দিনটি বর্তমানে নানা উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে সরকারী-বেসরকারীভাবে উদযাপিত হচ্ছে। তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে এ দিনটি উদযাপনের কোন নির্দিষ্ট নীতি বা কর্মসূচী সাধারণ্যে প্রচারিত না থাকায় যে যেমন খুশী তেমনিভাবে তা উদযাপন করছে।

শুরুতে ১লা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ উদ্যাপনের রীতি যদিও রাজধানী শহরেই বিশেষরূপে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ক্রমান্বয়ে তা বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কারণ মাছের পচন তো শুরু হয় মাথা থেকেই। আবহমান বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে বাংলা নববর্ষ উদযাপনের মধ্যে প্রতিফলিত নয় কেন সেটা যেমন একটি মৌলিক প্রশ্ন, তেমনি হঠাৎ করে বিজাতীয় ইসলাম-বিরোধী নানা অপসংস্কৃতি বিশেষত হিন্দু সংস্কৃতির নানা উৎকট পৌত্তলিক বা কুফরী প্রভাব আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কীভাবে, কাদের দ্বারা, কোন্ উদ্দেশ্যে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পাচ্ছে, তা আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার অপরিহার্য তাগিদেই গভীরভাবে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সহস্রাধিক বছর ধরে আমরা আমাদের গৌরবোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য টিকিয়ে রেখেছি এবং তার ভিত্তিমূলেই আমাদের স্বাধীন জাতিসত্তার বিকাশ ঘটেছে, এবং সে স্বতন্ত্র জাতিসত্তা স্বরূপ ও প্রাণশক্তিতে এতই প্রবল যে, তা শেষ পর্যন্ত উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে এক স্বতন্ত্র, স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে। সহস্রাধিক বছরের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ফলে আমাদের স্বাধীন জাতিসত্তার উদ্ভব ঘটে। আর একথা অস্বীকার করার কোন সঙ্গত কারণ নেই যে, ১৯৪৭ সনে বাংলাদেশের যে এলাকাসহ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়, সে এলাকা নিয়েই ১৯৭১ সনে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যূদয় ঘটে। অথচ বিগত কয়েক দশকের মধ্যে আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিহ্ন করে তথাকথিত সনাতন সংস্কৃতির নামে এক পৌত্তলিক অপসংস্কৃতি আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়ার অপতৎপরতা শুরু হয়েছে। এ অপসংস্কৃতির নগ্ন হামলা প্রতিরোধ করার জন্য আজ সকল বুদ্ধিজীবী ও সচেতন শিক্ষিত সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলা নববর্ষের নামে বর্তমানে যে সব অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হয়, বাঙালি মুসলমানদের আবহমান সংস্কৃতি ও জীবনাচারের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। বরং বাংলা নববর্ষের নামে একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবী যা কিছু করছেন তা মূলত হিন্দু সংস্কৃতিরই প্রতিরূপ। বাঙালি সংস্কৃতির নামে তা চালাবার ও একে সর্বজনীন বাঙালির সংস্কৃতি বলে দাবি করা হলেও শতকরা নব্বই জন বাঙালি তথা বাংলাদেশী মুসলমানের ঈমান-আকীদা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে তা সংগতিপূর্ণ নয়। এটা আমাদের জন্য বিজাতীয় অপসংস্কৃতি। বিগত হাজার বছর ধরে আমরা এ অপসংস্কৃতির প্রভাব এড়িয়ে চলতে সক্ষম হয়েছি, আমাদের নিজস্ব প্রাণবন্ত সংস্কৃতির চর্চা ও উৎকর্ষতার মাধ্যমে। আমরা যদি আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা না করতাম এবং সে সংস্কৃতি যদি এতটা প্রাণবন্ত ও উৎকৃষ্টতর না হতো, তাহলে আমাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার বিকাশ কখনো ঘটতো না এবং আমরা কখনো স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করতে পারতাম না। আজকের স্বাধীনতা আমাদের সে স্বতন্ত্র জাতিসত্তারই অনিবার্য ফল। স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র জাতিসত্তা এক ও অবিমিশ্র, পরস্পর নির্ভরশীল। স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র জাতিসত্তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ করা একান্ত অপরিহার্য। আত্মবিস্মৃতি কালক্রমে আত্মঘাতি হয়ে দেখা দেয়। তাই এ অপসংস্কৃতি তথা তৌহিদী বিশ্বাসের খেলাপ পৌত্তলিক সংস্কৃতির আগ্রাসন সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে এবং তা প্রতিহত করে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির উজ্জীবন বা চর্চা করার জন্য সচেতন শিক্ষিত মহলকে এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলা সন বাঙালি মুসলমানের ঐতিহ্য। বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনা, জীবনাচার ও সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তিতেই বাংলা নববর্ষ চিরকাল উদযাপিত হয়ে এসেছে এবং এখনও সে ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে হবে। নববর্ষের অনুষ্ঠান আজ বিশ্বব্যাপী সর্বত্র অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রত্যেক দেশ ও জাতি তাদের স্ব স্ব ঐতিহ্য-সংস্কৃতির আলোকেই নববর্ষের অনুষ্ঠান করে থাকে। মুঘল আমলে তৎকালিন শাসক-সম্প্রদায়ের অনুসরণে উচ্চ পর্যায়ের অভিজাত মহলে নওরোজ উদযাপিত হয়েছে। ইংরেজ আমলে ইংরেজি নববর্ষ উদযাপনের রেওয়াজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শুরু হয়। ইংরেজরা আমাদের দেশ থেকে বিদায় নিলেও, ইংরেজি শিক্ষা-সভ্যতা ও মন-মানসিকতায় গড়ে ওঠা একশ্রেণির বিত্তবান পাশ্চাত্যপন্থিরা এখনো তার অনুবর্তন করে চলেছে। বরং ইদানিং ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে অভিজাত হোটেল-রেস্তোরাঁ এবং নব্য বিত্তবান শ্রেণির কিছুসংখ্যক তরুণ-তরুণী যে ধরনের উচ্ছৃংখল আচার-আচরণ ও অনৈতিক-সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড শুরু করেছে, তা নিউইয়র্ক-লন্ডন-প্যারিসের তথাকথিত অভিজাত লম্পটদের আচরণকেও হার মানায়। এটাও এক নিকৃষ্ট ধরনের অপসংস্কৃতি। নববর্ষ উদ্যাপনের নামে যে ধরনের লাম্পট্য শুরু হয়েছে, তা কোন সুরুচি-শালীনতার পরিচায়ক নয়, কোন ভদ্র-সভ্য সমাজের নিকটই তা গ্রহণীয় হতে পারে না।

বাংলা সনের প্রথম দিনে আগে কোন অনুষ্ঠান হতো না বলে এখন হতে পারবে না, তা নয়। অবশ্য হতে পারে। তবে তা হতে হবে আমাদের নিজস্ব গৌরবোজ্জ্বল আদর্শ-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আদলে, বিজাতীয় অপসংস্কৃতির প্রভাবে নয়। এক্ষেত্রে ইসলামের ইতিহাস থেকে দুটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করা যায়। একটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সময় এবং অন্যটি তার কিছু পরে সংঘটিত হয়। কিন্তু ইসলামের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারায় তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রসঙ্গত এখানে তার উল্লেখ করা হল।

রাসূলুল্লাহ্ (স) মক্কা থেকে হিজরত করে যখন মদীনায় গেলেন, তখন দেখলেন সেখানকার মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই বছরের একটা নির্দিষ্ট দিনে আনন্দ-উৎসব করে। এ আনন্দ-উৎসব ছিল নেহায়েতই প্রথাগত, সামাজিক রীতি-নীতি অনুযায়ী। এর মধ্যে কুফরী ও ইসলাম-বিরোধী অনেক উপাদান থাকায় তিনি মদীনার মুসলমানদেরকে ডেকে বললেন যে, তোমরা এটা কীসের উৎসব পালন করছো? উত্তরে তারা বললো, পুরুষানুক্রমে আমরা এ ধরনের উৎসব পালন করে আসছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) বললেন, আজ থেকে এ ধরনের উৎসব পালন থেকে বিরত হও। আল্লাহ এর বদলে তোমাদের জন্য বছরে দুটি উৎসবের দিন নির্ধারণ করেছেন- একটি ঈদ-উল ফিতর ও আরেকটি ঈদ-উল আযহা। এভাবে উৎসব-আনন্দ করার সুযোগ বহাল রেখে রাসূলুল্লাহ্ (স) উৎসবের মূল নীতি, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যকে বদলে দিলেন। কুফরী রীতি-নীতির বদলে ইসলামী রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ দ্বারা সেটাকে পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও উৎকর্ষমণ্ডিত করলেন।

অন্য আরেকটি উদাহরণ দেয়া যায় পারস্যের ইতিহাস থেকে। ইসলাম-পূর্ব যুগে ইরানে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে নওরোজ উৎসব পালিত হতো। সুপ্রাচীন কাল থেকে পারস্য বা বর্তমান ইরানে এ উৎসব পালিত হয়ে আসছে। প্রাচীন ইরানের ফারস এলাকায় জরাথুস্ত্রীয়রা নববর্ষের সূচনায় এ অনুষ্ঠান পালন করতো। অবশ্য এটা তারা পালন করত তাদের ধর্মীয় বিধান ও আচার-আচরণ অনুযায়ী। এদিনে তারা আহুরমাজদার (স্রষ্টা) উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে নিবেদন করে তাঁর নিকট সততা, ন্যায়পরায়ণতা, ঈমান, সদুপদেশ, সৎকর্ম, সৌভাগ্য, ক্ষমা ও অমরত্ব প্রার্থনা করতো। এগুলো অবশ্য সবই মানবিক মূল্যবোধের পরিচায়ক, কিন্তু এর উৎসে রয়েছে শেরক্। তাই ইসলাম গ্রহণের পর ইরানিরা এ শেরক্ মূলোচ্ছেদ করে ইসলামী রীতি-নীতি অনুযায়ী তা পালনের ব্যবস্থা করে।

ইরানে ইসলাম আগমনের পর নওরোজ উৎসব বহাল রাখা হলেও তা ইসলামী ধারণা-বিশ্বাস অনুযায়ী প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা হয়। ইরানিরা নওরোজকে ঈদ-ই-নওরোজ বলে। ঈদ মানে খুশী, দুই ঈদের আনন্দ-উৎসবের মতোই সেখানে নওরোজ উৎসব পালিত হয়। ইরানে শিয়া মতাবলম্বীদের প্রাধান্য। শিয়াদের নেতা, আওলাদে রাসূল (স) ইমাম জাফর সাদেকের (রা) নির্দেশ ছিল : নওরোজে তোমরা রোজা রাখো, গোসল করো, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করো, খুশবু ব্যবহার করো, চার রাকাত নামাজ পড়ো।

এ নির্দেশ অনুযায়ী ইরানি মুসলমানগণ নওরোজের শুরুতে অযু করে পাক-সাফ হয়ে নামায পড়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করার মাধ্যমে উৎসব শুরু করে। দোয়াতে আল-কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে বলা হয়: ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব ওয়াল আবসার, ইয়া মুদাব্বিরাল লাইলি ওয়ান্নাহার, ইয়া মুহাববিলাল হাল ওয়াল আহওয়াল, হাববিল হালানা ইলা আহসানিল হাল। অর্থাৎ হে অন্তরসমূহ ও দৃষ্টিসমূহের বিবর্তনকারী, হে বৎসর ও অবস্থাসমূহের পরিবর্তনকারী, আমাদের অবস্থাকে উত্তম অবস্থায় পরিবর্তন করুন। এভাবে প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত একটি সামাজিক প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠানকে মুসলমানগণ ইসলামী ধারায় রূপান্তরিত করেন।

ইমান, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সালাত ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়। এটা ইসলামী সংস্কৃতিরও মৌল উপাদান। সংস্কৃতি মানে সংস্কার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছতা, উৎকর্ষতা, সুরুচি ও সৌন্দর্য। ইসলাম এ সবের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সৎ, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, সুরুচিসম্পন্ন, নিষ্কলুষ জীবন গঠনই ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। সুস্থ, উৎকর্ষমণ্ডিত সংস্কৃতি নির্মাণেরও এগুলো মৌল শর্ত। সেভাবে নওরোজ অনুষ্ঠানের রীতি-নীতি পরিবর্তন করে ইরানি মুসলমানগণ তা যুগ যুগ ধরে পালন করে আসছে। ইরানে ইসলামী বিপ্লব সাধনের পরও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। যে কোন দেশের সংস্কৃতিতে সে দেশের ধর্মীয়, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও জাতীয় মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে থাকে। যা কিছু এর বিপরীত তা অবশ্যই অপসংস্কৃতি হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। ইরানের নওরোজ উৎসবেও এ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইসলাম-পূর্ব যুগে সে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ছিল এক রকম, ইসলামের আগমনের পর তা ভিন্নরূপ লাভ করেছে। ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পরও সে ধারা অব্যাহত রয়েছে।

কিন্তু বাংলা নববর্ষ উদ্যাপনের ক্ষেত্রে আমরা বিপরীত চিত্রটিই লক্ষ্য করছি। পূর্ব থেকে বাঙালি মুসলমানগণ নিজস্ব ধর্মীয় রীতি-নীতি অনুযায়ী বাংলা নববর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠান অর্থাৎ হালখাতা, নবান্ন ইত্যাদি পালন করে আসছে। ইদানীং তাদের সে সাংস্কৃতিক রূপ-রীতি পরিবর্তন করে তথাকথিত □সনাতন সংস্কৃতি□র নামে বিজাতীয় রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান তাদের উপর চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা আমাদের সংস্কৃতির উপর এক নগ্ন হামলা। এর দ্বারা আমাদের সংস্কৃতিকে বিকৃত করে একে এক ধরনের অপসংস্কৃতিতে পরিণত করার অপপ্রয়াস সুস্পষ্ট। বাংলা নববর্ষ বাঙালি মুসলমানগণ আগে থেকে যেভাবে প্রতিপালন করে আসছে, এখনো তা অব্যাহত থাকা উচিত। কাল-বিবর্তনে সবকিছুর মধ্যেই উন্নতি, সংযোজন, উৎকর্ষসাধন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তা অবশ্যই আমাদের ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

বাংলা সন যেমন আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে, বাংলা নববর্ষ উদযাপনেও তেমনি আমাদের আদর্শ-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটা বাঞ্ছনীয়। তাই বিদেশী-বিজাতীয় সংস্কৃতি তথা অপসংস্কৃতির প্রভাব থেকে বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠানমালাকে বিমুক্ত রাখা আমাদের একান্ত কর্তব্য। আমাদের নিজস্ব বোধ-বিশ্বাস ও আচরিত সংস্কৃতির রূপরেখা অনুযায়ী তা পালিত হওয়া বা তার চর্চা করা কর্তব্য। পৌত্তলিকতা, অশ্লীলতা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, উশৃঙ্খল ও কুরুচিপূর্ণ আচরণ আমাদের সংস্কৃতির সাথে অসংগতিপূর্ণ। তৌহিদী জীবনবোধসম্পন্ন সুস্থ, সুরুচিপূর্ণ সংস্কৃতিই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির মৌল পরিচয়। সুস্থ সংস্কৃতি, সুস্থ-সুন্দর-স্বাস্থ্যেজ্বল জাতি গঠনের অপরিহার্য শর্ত। হীনমন্যতা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে নয়, বরং ইতিবাচক ও প্রত্যয়ী মনোভাব থেকেই সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে আমাদেরকে অপসংস্কৃতির মোকাবেলা করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, যেসব অনুষ্ঠান জাতীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের বিপরীত এবং যেসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেলেল্লাপনাকে প্রশ্রয় দেয়া হয় এবং নৈতিকতার অধঃগতি ঘটে, তা সংস্কৃতি নয়, অপসংস্কৃতি। সংস্কৃতি হলো পরিশীলিত, পরিমার্জিত, সুস্থ, বিকাশোন্মুখ চেতনার ধারক। যা কিছু অসুস্থ, অমার্জিত ও নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটায় তাই অপসংস্কৃতি। অপসংস্কৃতি যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে। মুসলিম জাতিরও অবক্ষয় শুরু হয়েছিল অপসংস্কৃতির প্রভাবে। স্বকীয় আদর্শ, ঐতিহ্য ও নৈতিক চেতনা বিস্মৃত হয়ে বিজাতীয়, অনৈতিক অপসংস্কৃতি গ্রহণ করার ফলেই মুসলমানদের পতন ঘটে। সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের মাধ্যমে যে স্খলন শুরু হয়, ক্রমান্বয়ে তা রাজনৈতিক-সামাজিক ও জাগতিক অবনতির পথ প্রশস্ত করে। ফলে অন্যের অধীনে মুসলিম জাতিকে দীর্ঘ কাল পরাজিত-অবহেলিত ও দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাপন করতে হয়।

আমরা কি অনিবার্য ধ্বংসের দিকে যেতে চাই, না সুস্থ-সুন্দর জীবনবোধে উজ্জীবিত হয়ে মহৎ ও কল্যাণময় জীবন গড়তে চাই? সে মৌলিক প্রশ্নের মীমাংসা করে জাতীয় সাংস্কৃতিক নীতিমালা তৈরি করে জাতিকে সুষ্ঠু-সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সমাজের সুস্থ বিবেকবান মানুষকে সচেতনভাবে বিচার-বিবেচনা করে নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে। জাতীয় গৌরব ও ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা এর উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির মৌল স্বভাব এদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস, জাতীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, সামাজিক মূল্যবোধ, জীবন-যাপন পদ্ধতি ও আচার-আচরণের ভিত্তিতে পরিনির্মিত। সহস্রাধিক বছর ধরে আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের গভীরে অন্তঃসলিলার ন্যায় এর মূল স্রোতধারা প্রবহমান। মূলধারার পাশাপাশি অনেক সময় ক্ষুদ্র প্রস্রবণ বা নির্ঝর উদগত হয়। এগুলোকেও উপেক্ষা করা যায় না। এগুলো তার নিজস্ব রূপ, স্বভাব ও প্রকৃতি নিয়ে সর্বদা বিরাজমান থাকে। এটা যেমন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে, তেমনি সৌন্দর্য সৃষ্টিতেও সাহায্য করে।

সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশে কখনো আর্য, কখনো অনার্য, কখনো হিন্দু, কখনো জৈন, কখনো বৌদ্ধ, আবার কখনো লোকজ মিশ্র সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। মুসলমানদের আগমনের পর বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ক্রমান্বয়ে মুসলমান হবার ফলে এদেশে ইসলামী সংস্কৃতির প্রাধান্য সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের সামাজিক রূপ ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য তার ভিত্তিতেই পরিচিহ্নিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দু, বৌদ্ধ, বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠির সংস্কৃতিও নির্বিবাদে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। শাসক বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ কখনো তাতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। মুসলিম শাসনামলের সাড়ে পাঁচশ বছর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ বাঙালি শান্তি, সমৃদ্ধি ও সম্প্রীতি-সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি অনুযায়ী স্বচ্ছন্দে নিরুদ্বিগ্ন জীবন-যাপন করেছে। সৃষ্টিশীল কাজেও তারা পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করেছে। শাসন-ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে থাকলেও এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তারা সংখ্যালঘুদের ধর্ম-বিশ্বাস ও সংস্কৃতি চর্চার উপর কখনো হস্তক্ষেপ করেনি। ফলে এটা ইতিহাসে □স্বর্ণযুগ□ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

এটাকে একটি বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বৃক্ষের মূলকাণ্ডের পাশাপাশি অসংখ্য ডালপালার বিস্তার ঘটে। মূলকাণ্ড মৃত্তিকার গভীরে প্রোথিত থেকে বৃক্ষকে শক্তি ও সজীবতা যোগায়। মূলকাণ্ডের সাথে অসংখ্য ডালপালা ও শাখা-প্রশাখা গজিয়ে বৃক্ষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আমাদের সংস্কৃতির মূলধারাও তেমনি একটি বৃক্ষের মূলকাণ্ডের সাথে তুলনীয়। এর পাশাপাশি হিন্দু, বৌদ্ধ, উপজাতীয় ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্কৃতি বৃক্ষের ডালপালা ও শাখা-প্রশাখার মতোই বৈচিত্র্য সৃষ্টি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে চলেছে। মূলকাণ্ড কখনো ডালপালা ও শাখা-প্রশাখার ক্ষতি করে না, বরং তার সজীবতা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। অনুরূপভাবে, সংখ্যাগরিষ্ঠের নৈতিক দায়িত্ব হলো সংখ্যালঘিষ্ঠের সংস্কৃতির লালন, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করা। এটা শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান ও গণতান্ত্রিক ঔদার্য ও মানবিক মূল্যবোধের পরিচায়ক। কিন্তু ঔদার্য প্রকাশ করতে গিয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠের জীবনধারা ও সংস্কৃতির মধ্যে জাতীয় মূলধারাকে অবুলুপ্ত বা একাকার করে ফেলা সঙ্গত নয়। এরদ্বারা কেবল আত্ম-অবলুপ্তি ও আত্ম-বিনাশের পথই উন্মুক্ত হয়। আত্ম-সচেতনতা আত্ম-বিশ্বাস ও আত্ম-প্রত্যয়কেই সুদৃঢ় করে। স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের জন্য যা একান্ত অপরিহার্য।

মুহম্মদ মতিউর রহমান

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান এর জন্ম ৩ পৌষ, ১৩৪৪ (১৯৩৭ ইং) সন, সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত শাহজাদপুর থানার চর নরিনা গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস উক্ত একই উপজেলার চর বেলতৈল গ্রামে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সনে বাংলায় এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন।
কর্মজীবনে তিনি সিদ্বেশ্বরী কলেজ ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে অধ্যাপনা করেছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকল্পে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সংগঠক হিসেবে তাঁর রয়েছে বৈচিত্রময় ভূমিকা। তিনি ঢাকাস্থ "ফররুখ একাডেমীর" প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং বাংলা একাডেমীর জীবন সদস্য।
তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য কথা (১৯৯০), ভাষা ও সাহিত্য (১৯৭০), সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি (১৯৭১), মহৎ যাদের জীবন কথা (১৯৮৯), ইবাদতের মূলভিত্তি ও তার তাৎপর্য (১৯৯০), ফররুখ প্রতিভা (১৯৯১), বাংলা সাহিত্যের ধারা (১৯৯১), বাংলা ভাষা ও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন (১৯৯২), ইবাদত (১৯৯৩), মহানবী (স) (১৯৯৪), ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি (১৯৯৫), মহানবীর (স) আদর্শ সমাজ (১৯৯৭), ছোটদের গল্প (১৯৯৭), Freedom of Writer (১৯৯৭), বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য (২০০২), মানবাধিকার ও ইসলাম (২০০২), ইসলামে নারীর মর্যাদা (২০০৪), মাতা-পিতা ও সন্তানের হক (২০০৪), রবীন্দ্রনাথ (২০০৪), স্মৃতির সৈকতে (২০০৪)। এছাড়াও তাঁর সম্পাদনায় ফররুখ একাডেমী পত্রিকা প্রকাশিত হয়।